যুগান্তর

তারিখ ... 8 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ

মোঃ মুজিবুর রহমান

কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৫ সাল থেকে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরিচালিত বিএড কোর্সে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রম তখন থেকেই বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ হয়। এ শিক্ষাক্রমে যেসব শিখনক্ষেত্র (বিষয়) নির্ধারণ করা হয় তার সবই মাধ্যমিক স্তরের দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে সহায়ক হবে বিবেচনা করা হয়। এ শিক্ষাক্রমের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়ার কথা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হওয়ার কথা অংশগ্রহণমূলক। অন্যদিকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যারা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন, তাদের অধিকাংশই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর উন্নত প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। দেশেও তাদের জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার ধরে নিয়েছিল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রশিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণে গুণগত পরিবর্তন আসবে এবং নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে সেটিও হবে উন্নত ও আধুনিক। মূলত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা সরকারের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সরকারের এ উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জিত হয়নি বিভিন্ন সমস্যার কারণে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ১ হাজার ২৭ শিখনঘণ্টা ব্যয় করার কথা। বাস্তবে প্রশিক্ষণে এর অর্ধেকেরও কম শিখনঘণ্টা অর্জিত হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন করা হলেও এর মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনেকটাই ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণে আরও নানা ধরনের সমস্যার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূর করতে না পারলে প্রশিক্ষণে গুণগত পরিবর্তন আসবে না। আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে গুণগত পরিবর্তন না হলে স্কুলগুলোয় পাঠদানের মান কেমন হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে দুই পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। এর একটি হল, ৫২৫ নম্বরের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং অন্যটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪৭৫ নম্বরের বহিঃস্থ মূল্যায়ন। বহিঃস্থ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূলত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষা প্রাধান্য পায়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোয় অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন যেভাবে পরিচালনা করা হয় তাও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। অভ্যন্তরীণ কোর্সে লিখিত পরীক্ষার নিয়ম রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মুখস্থ করার সামর্থ্য যাচাই করা হয় শুধু। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলোর বেশির ভাগ জ্ঞানমূলক। অথচ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যাচাই এবং তাদের সৃজনশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিষয়ে সারা বছর নানা ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট পরিচালনা করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এসব অ্যাসাইনমেন্ট যথাযথভাবে পরিচালনা না করার কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ করার দক্ষতা বা সামর্থ্য যাচাই করা সম্ভব হয় না। প্রশিক্ষণার্থীরা যেসব অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করেন সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে নামমাত্র। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ লিখিত পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষার অংশ হলেও এ পরীক্ষা পরিচালনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অংশগ্রহণ থাকে না। এ কারণে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, রুটিন তৈরি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কলেজ থেকে প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ করে পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করে। প্রতিটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যে পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় যদি কেন্দ্রীয়ভাবে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা দিত, তাহলে সব কলেজের মধ্যে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সমতা বিরাজ করত। পরিতাপের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই বিএড চূড়ান্ত পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করে না।

প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নের জন্য বিএড কোর্সের সিলেবাসে যেসব নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো আধুনিক হলেও বাস্তবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভর করে লিখিত পরীক্ষার ওপর। এমনকি পুরো শিক্ষাবর্ষে দুটি অভ্যন্তরীণ এবং একটি চূড়ান্ত পরীক্ষাই হয়ে ওঠে প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নের প্রধান হাতিয়ার। ঠিক এ কারণে বিএড কোর্সে শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়ে উঠছে পরীক্ষানির্ভর। ফলে এটি হারাচ্ছে সার্বক্ষণিক কোর্সের বৈশিষ্ট্য। কাজেই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন জরুরি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রচলিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে লিখিত পরীক্ষানির্ভর না রেখে সেটি সপ্তাহব্যাপী অথবা মাসভিত্তিতে মূল্যায়নে রূপান্তর করা দরকার। লিখিত পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত করে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি মাসে যে কোনদিন পাঠদানের বিষয়ের ওপর নানা ধরনের স্পট অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, লিখিত ও মৌখিক উপস্থাপন, সেমিনার, প্যানেল ডিসকাশন, সিন্ডিকেট প্রিপারেশন, কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা, বিভিন্ন দল গঠন করে ওয়ার্কশপ পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া পুরো সপ্তাহে প্রশিক্ষণে যেসব বিষয়বস্তু আলোচনা করা হবে সেগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু করা দরকার। তাহলে সবাই সারা বছর কলেজে উপস্থিত থাকবেন। প্রশিক্ষণে যদি সপ্তাহভিত্তিক নম্বর বরাদ্দ থাকে তাহলে প্রশিক্ষণার্থীরা যেমন প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকবেন নিয়মিত, তেমনি প্রশিক্ষকরাও ব্যস্ত থাকবেন প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট কাজে। সপ্তাহ অথবা মাসভিত্তিক যে নম্বর বরাদ্দ রাখা হবে তা হতে পারে চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ ও চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে সেভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই যথাযথ হয় না বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেখানে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে না বললেই চলে। যেসব প্রশ্ন থাকে তার অধিকাংশের উত্তর হয়ে থাকে রচনামূলক ও মুখস্থনির্ভর। অথচ এই শিক্ষকরাই বিএড কোর্সে প্রশিক্ষণ শেষে স্কুলে গিয়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়ালেখা করাবেন এবং তাদের মূল্যায়নের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হবেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, যে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণে নিজেদের পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নের মুখোমুখি হন না, তারাই স্কুলে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ প্রক্রিয়া বিভ্রান্তিমূলক।

বর্তমানে যেভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে, তা একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রমের আওতায় হলেও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষার প্রাধান্যের কারণে পুরো প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হয়ে উঠছে গাইডনির্ভর। অন্য কথায়, প্রশিক্ষণ হচ্ছে সনদসর্বস্ব। লিখিত পরীক্ষার ত্রুটির কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণে মূল বই কিংবা কোন রেফারেন্স বই অনুসরণ করেন না। তারা পরীক্ষার জন্য নির্ভর করেন নানা ধরনের নোট-গাইডের ওপর। এমনকি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে, সেগুলোর জন্য যেসব প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় তাও নোট-গাইড থেকে হুবহু তুলে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন তাদের অনেকেই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই ধরনের প্রশ্ন বছরের পর বছর ব্যবহার করছেন। ফলে প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়নও হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ। এভাবে কি শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব?

মোঃ মুজিবুর রহমান: সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
mujibur29@gmail.com